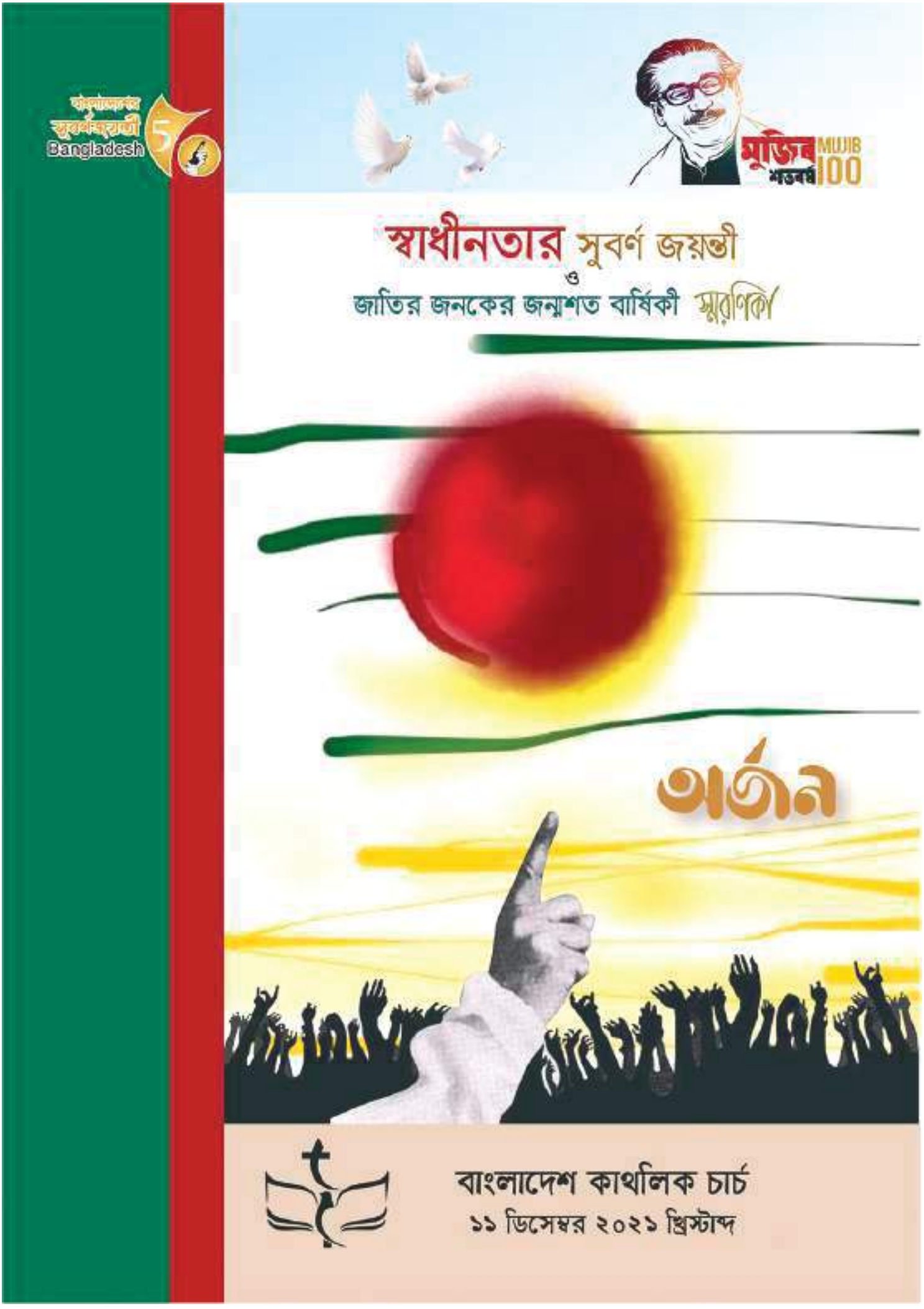
বাংলাদেশ
সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh 50
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী
ও
জাতির জনকের জন্মশত বার্ষিকী স্মরণিকা
অর্জন
বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ
১১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১৯৭১
স্বাধীনতা যুদ্ধ ও খ্রিস্টান শিল্পী সমাজ

ক্যাথরিন পিউরীফিকেশন

শিল্পীর পরিচয় তাঁর নিজস্ব ধর্মে- সে ধর্ম সৃষ্টি করবার আনন্দে। তাঁর সৃষ্টি স্থান কাল পাত্র ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন প্রচলিত কৃত্যমূলক ধর্মের অনুসারী পরিচয়ে অসীম ভুবনের শিল্পীকে সীমিত করা সঙ্কীর্ণতা। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা ও নির্মাতা সকলেই সহোদর। কে হিন্দু কে মুসলিম- বৌদ্ধ আর খ্রিস্টান সে প্রশ্ন অবান্তর। বর্তমান নিবন্ধে যাদের উল্লেখ রয়েছে তাঁরা বিশ্বজনীন। তবে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে আত্মত্যাগী ও পরবর্তী দেশগঠনে উদ্যোগী-সক্রিয় মানুষদের অন্যান্য পরিচয়ের সাথে 'খ্রিস্টান' পরিচয়টি একেবারে নগন্য নয়। কারণ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের চারশ বছরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গড়ে উঠেছে একটি পৃথক সংস্কৃতি। এখানে ভূমিপুত্রদের আবহমান সংস্কৃতির সাথে মিলেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্রতধারী-ব্রতধারিণী ও মিশনারিদের সংস্কৃতি।

বাংলাদেশের প্রবাদপ্রতিম বন্ধু জর্জ হ্যারিসন ও রবি শঙ্করের 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'এ যুক্ত হলেন মার্কিন শিল্পী বব ডিলান, রিঙ্গো স্টার, বিলি প্রিস্টন, লিয়ন রাসেল প্রমুখ- চল্লিশ হাজার

লোকের সামনে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশার কথা তুলে ধরলেন। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগৃহীত ২,৩৪,৪১৮,৫০ ইউএস ডলার দান করা হল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। নিউইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কয়ারে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'এ যে শিল্পীরা সেদিন গেয়ে উঠেছিলেন কিংবা ইংল্যান্ডের লিভারপুলে শিল্পী লি ব্রেনান স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর চারটি গান লিখে তাঁর বন্ধুরা মিলে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট ও পানশালায় গান গেয়ে তহবিলের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের সিংহভাগ ধর্মীয় পরিচয়ে খ্রিস্টান হতে পারেন- কিন্তু সে পরিচয় তাদের অস্তিত্বের একটি দিক মাত্র। তাঁরা জাত-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে অন্য অনেক বিষয়ের মত স্বাধীনতা যুদ্ধে খ্রিস্টান শিল্পীদের অংশগ্রহণ ছিল কিনা সে বিষয়ে দীর্ঘসময় গবেষণার প্রয়োজন। যুদ্ধের সময় ধর্মীয় পরিচয়ে বা ধর্মীয় সংগঠনের আওতায় থেকে শিল্পীরা কাজ করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে কোন লিখিত ইতিহাস নেই। প্রতিমুহূর্তে জীবনের তীব্র অনিশ্চয়তায় শিল্প মাধ্যমে প্রতিরোধের ঘটনা যে ঘটবে না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে যুদ্ধ সময়কালীন ঘটনাবহুল জীবন যারা পার করেছেন তাদের অধিকাংশ এখন বার্ধক্যে। আমরা হারিয়েছি, ক্রমাগত হারাচ্ছি ইতিহাসের সাক্ষী সেইসব স্মৃতিচারী মানুষকে। ক্রমেই স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ৭১ এ যাপিত প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবন। সে জীবন প্রতিনিয়ত ভিন্ন ভিন্ন গল্প বলে- তার বহুমাত্রিকতা অন্বেষণে বর্তমান প্রবন্ধের সূচনা।

স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্মুখ সমরের যোদ্ধাদের সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল যে শিল্পমাধ্যম তা সঙ্গীত। গানগুলোর অধিকাংশেরই জন্ম ৭১ এ- উত্তাল সময়ে। যে সুতীব্র অনুভূতি থেকে ওগুলো সৃষ্টি হয়েছিল তা পরবর্তীতে কখনোই সম্ভব হয়নি। গানের বাণী-সুর-তাল-লয়-ছন্দ শিল্পীর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয়ে প্রবেশ করেছে যোদ্ধা ও জনতার মনোজগতে। বাংলাদেশের বাইরে ভারতে বাঙালী শিল্পী বিশেষ করে বাংলাদেশি সঙ্গীত শিল্পীরা ছিলেন সক্রিয়। তাদের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল ভ্রাম্যমান দল তৈরি করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবিরে সঙ্গীত পরিবেশন করে যোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। শরণার্থী শিবিরে শরণার্থীদের মধ্যে আশার সঞ্চার করা। (সুলতানা:২০২০) এক্ষেত্রে অবিসংবাদী ভূমিকা রেখেছিলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ অপারেশন সার্চ লাইটের মাধ্যমে হাজার হাজার নিরস্ত্র বাঙালী নিধন করলে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন বেতারকর্মী ২৬ মার্চ তাৎক্ষনিকভাবে কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' নামে অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বেলাল মোহাম্মদ এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য- আবদুল্লাহ-আল-ফারুক, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, কাজী হাবিবউদ্দিন আহমেদ মনি, আমিনুর রহমান, রশিদুল হোসাইন, এ.এম শরফুজ্জামান, রেজাউল করিম চৌধুরী, সৈয়দ আবদুস শাকের, মুস্তফা মনোয়ার প্রমুখ। পরবর্তীতে ২৮ মার্চ মেজর জিয়ার অনুরোধে বিপ্লবী নামটি বাদ দিয়ে রাখা হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। ৩০ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিমান হামলায় বেতার কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্থ হলে প্রতিষ্ঠাতা কর্মীরা ভারতের আগরতলা ও ত্রিপুরায় ছড়িয়ে পরেন। ২৫ মে কলকাতার বালিগঞ্জের সার্কুলার রোডের ৫৭/৮ এর দোতলা বাড়িতে একটি কক্ষে ট্রান্সমিটার দিয়ে সম্প্রচার শুরু করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। (মোহাম্মদ: ২০১৫, পৃ. ৪৫-৫০)

স্বাধীন বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত বিভাগের প্রধান পরিচালক ছিলেন গ্রেগরীয়ান সমর দাস। মার্চ মাসে সমর দাস পরিবারসহ কুড়িগ্রাম বেড়াতে যান। সেখানে থেকেই ঢাকায় সশস্ত্র হামলার খবর পান। ছোট ছেলে আলবার্ট ছোটন দাশের স্মৃতিচারণায় জানা যায়-

তখন মার্চ মাস। ১৯৭১। সেইসময় বাবা, ভাইবোন, মা- আমরা কুড়িগ্রাম ঘুরতে যাই। ঢাকায় তখন গণ্ডগোল শুরু হয় (২৫ মার্চ)। নবাবপুরে বিহারিরা মানুষ কাটছে। দুই কি তিনদিন পর আমরা পিসির বাসায় যাই। তারপরই যুদ্ধ শুরু হয়। বাবা

(সমর দাস) ঢাকায় আসার চেষ্টা করলেন, ভুরুঙ্গামারিতে এসে দেখলেন রেললাইন তুলে ফেলেছে। ঢাকায় যেতে পারলেন না কুড়িগ্রাম ফিরে এলেন। দূরে বোমা বর্ষণের শব্দ শুনতে পাই। হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামে হানা দিতে পারে। পড়ে কুড়িগ্রাম থেকে ষোলখান চলে এলাম। কিছুদিনের মধ্যে এখানেও চলে আসছে পাকিস্থানিরা। বাবার মুখে তখন খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। দুশ্চিন্তায় মুখ বিবর্ণ। সিদ্ধান্ত নিলেন যাই হোক সীমানা পার হয়ে ভারতে যাবেন। চারিদিকে তখন বোমা বর্ষণ হচ্ছে। আমরা একটা গরুর গাড়িতে করে ধীরে ধীরে সীমানা পার হলাম। তখন প্রায় রাত আড়াইটা কি তিনটা। আমাদের কোন আশ্রয় ছিল না। সীমান্তর কাছেই জগদীশ নামে এক মসলার ব্যবসায়ী- স্মাগলারই বলা যায়- শুকনো মরিচের ব্যবসা করত। তার বাসায় আশ্রয় চাইলাম- প্রথমে শুনতে চাইলেন না। অনেক অনুরোধের পর সেই রাতের মত কোথার ঘরে আমাদের থাকতে দিলেন। আমরা সারাদিন সারারাত অভুক্ত। পরদিন সকালে জগদীশের স্ত্রী ঘি চিনি মিশানো এক থামা মুড়ি এনে বলল খান। আমরা সবাই তৃপ্তি নিয়ে খেলাম- এক কণাও অবশিষ্ট ছিল না।

কিছুদিন পর আমরা সীমানার কাছেই দিনহাটা মিশনে গেলাম। সেখানে অনেক বাঙ্গালী শরণার্থী পেলাম। ওখানে একটা এনজিও ত্রাণ দিত। নরওয়েজিয়ান ডক্টর হুডনি ছিলেন এনজিওর প্রধান কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি শুনলেন এখানে পূর্ব পাকিস্থান বেতারের সঙ্গীত বিভাগের প্রধান পরিচালক সমর দাস আছেন। তিনি বাবার সাথে কথা বললেন- সবকিছু শুনে কুচবিহার চলে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন।

হুডনি কুচবিহারে একটি হোটেলে সমর দাশের পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করেন। তার প্রস্তাবে সাময়িক ভাবে কুচবিহার 'ব্লাইন্ড স্কুল'এ (সম্ভবত N.E.L.C. School for the Blind) সমর দাস পিয়ানো শেখানো শুরু করলেন। মাসখানেক পর তাঁর পিয়ানো শুনে মুগ্ধ হয়ে বললেন- দেশ স্বাধীন হবার সম্ভাবনা কম, জেনেভাতে অবস্থিত 'মিউজিক সেন্টার'এ বাংলা সঙ্গীত বিভাগে কাজ করতে পারো। এর মধ্যে তাজউদ্দীন আহমেদ (বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী) খবর পেলেন সমর দাস সীমানা পার হয়ে ভারতে অবস্থান করছেন। তাঁকে ফোন করে কলকাতা যেতে বললেন। সমর দাসের আর জেনেভায় যাওয়া হয়নি- এক সপ্তাহের মধ্যে সপরিবারে চলে গেলেন কলকাতা। 'মুজিবনগর'এর রেগুলার পোস্টিং এর বাইরেও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের ত্রৈমাসিক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো। এ চুক্তি অনুযায়ী সমর দাস সঙ্গীত বিভাগের প্রধান পরিচালক হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যুক্ত হলেন। বেতার কেন্দ্রের উদ্যোগে জৈথপুরে তাঁকে একটি ঘর দেওয়া হল। এখানেই আসতেন শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়, গোবিন্দ হালদার প্রমুখ। সারাদিন চলত গানের মহড়া। আবার বাসা থেকে বালিগঞ্জের সার্কুলার রোডে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যেতেন নিয়মিত। এ সময়ই সৃষ্টি হল কালজয়ী কিছু গান। গানের সুরারোপ করলেন সমর দাস। সুরারোপ হলে বেশ উৎফুল্ল থাকতেন। এ গানগুলিতে ছিল বিজয়ের অনুপ্রেরণা- যা উত্তাল সময়ে যোদ্ধাদের মনোবল দৃঢ় রাখতে সাহায্য করেছিল। যার মধ্যে অন্যতম-

১। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল: (কথা) গোবিন্দ হালদার
২। তারা এ দেশের সবুজ ধানের শীষে: (কথা) মোস্তা মনিরুজ্জামান মনির
৩। জলপথ প্রান্তরে সাগরের বন্দরে: (কথা) মুস্তাফিজুর রহমান
৪। ভেবো না গো মা তোমার ছেলেরা: (কথা) মুস্তাফিজুর রহমান
৫। আমার নেতা, তোমার নেতা শেখ মুজিব: (কথা) আবদুল গাফফার চৌধুরী
৬। নোঙ্গর তোল তোল, সময় যে হলো হলো: (কথা) নঈম গওহর

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে গানটি রচনা ও সুরারোপ করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বসে। গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ারের মতে, এই গানটি স্বাধীনতা যুদ্ধের সেরা পাঁচটি গানের একটি।

১৯৭২ সালে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে 'আমার সোনার বাংলা' গানটির প্রথম দশ লাইন সদ্যগঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'র জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হয়। গানের সুরবিন্যাসের দায়িত্ব পান সমর দাস। লন্ডনে তিন মাস থেকে London Philharmonic Orchestra দিয়ে গানের সুর বিন্যাস করে মূল গানটি লন্ডন থেকে সামরিক ব্রাশব্রান্ডে রেকর্ড করেন তিনি।

এ সুর আজ সারা বিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। ভৌগলিক সীমানা ছাড়িয়ে তা এখন বিশ্বজনীন।

প্রেপরীয়ান সমর দাসের জন্ম ১৯২৯ সালের ১০ ডিসেম্বর পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজার নবদ্বীপ বসাক লেনে। বাবা জিতেন্দ্রনাথ দাস এবং মা কমলিনী দাস। জিতেন্দ্রনাথ দাস বাদ্যযন্ত্রের টিউনিং করতেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে অল ইন্ডিয়া রেডিও'র ঢাকা কেন্দ্রে বাঁশি বাজানোর মধ্য দিয়ে সমর দাসের সঙ্গীত জীবনের সূচনা। এরপর কলকাতায় হিজ মাস্টার্স ভয়েস (HMV) কোম্পানিতে কাজ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি কালিপদ সেনের 'লটারি' চলচ্চিত্রে যুগ্ম সংগীত পরিচালক হিসেবে সলিল চৌধুরীর সাথে কাজ করেন। ১৯৫৫ সালে আব্দুল জব্বার খাঁয়ের পরিচালিত বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' এবং পরবর্তীতে 'লটারী', 'মাটির পাহাড়', 'আসিয়া', 'গৌরী', 'ধীরে হবে মেঘনা', 'রাজা এলো শহরে' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করেন। ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্থানের ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত বিভাগের প্রধান পরিচালক পদে যোগদান করেন। সদ্য স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ বেতারের সিগনেচার টিউন বা সূচনা সঙ্গীতের বিন্যাস তাঁর হাত ধরে। ১৯৭২ সালে সমর দাসের সঙ্গীত পরিচালনায় কোলকাতার HMV স্বাধীনতা যুদ্ধে রচিত ২৬টি গানের লং প্লে-রের্কড 'বাংলাদেশের হৃদয় থেকে' প্রকাশ করে। তাঁর সুরারোপিত গানের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। তিনি একাধারে শিল্পী, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক, বাদ্যযন্ত্র বাদক। দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ সাফ গেমসের উদ্বোধনী ও সমাপনী সঙ্গীতের অনন্য সাধারন আয়োজন করেন তিনি। ১৯৭৯ সালে সঙ্গীতে অসামান্য অবদানের জন্য লাভ করেন দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার "স্বাধীনতা পুরস্কার"। ২০০১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলা সঙ্গীতের এই প্রবাদ পুরুষ চিরনিদ্রায় শায়িত হন। (আলবার্ট ছোটন দাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২ অক্টোবর, ২০২১)

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের আরেক কণ্ঠ সৈনিক ডেভিড প্রণব দাস। ভবিষ্যতের অসাম্প্রায়িক বাংলাদেশের স্বপ্নে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নতুন নতুন অনুষ্ঠান সংযোজন করা হত। অনুষ্ঠানে খবর, নাটক, সঙ্গীত, কথিকার সাথে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থকে পাঠ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। প্রতিদিন সকাল ৭:০২ মিনিটে কোরান পাঠ ও অনুবাদ করা হত। গীতা পাঠ বৃহস্পতিবার, ত্রিপিটক পাঠ মঙ্গলবার এবং বাইবেল পাঠ করা হত প্রতি রবিবার। বেলা ১:২৩ মিনিট থেকে পরবর্তী ৭ মিনিট নির্ধারিত ছিল বাইবেল পাঠের জন্য। ডেভিড প্রণব দাস এ সময় প্রতি রবিবার বাইবেল পাঠ করতেন। (মোহাম্মদ: ২০১৫, পৃ. ১১৪-১১৫)

যুদ্ধ পূর্ববর্তী এ কণ্ঠসৈনিক যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে প্রযোজনা করেন 'একাত্তরের যীশু' (Jesus 71)। শাহরিয়ার কবিরের লেখা ছোটগল্প একাত্তরের যীশু অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেন নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু। লন্ডন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (১৯৯৪), এডিনবার্গ (স্কটল্যান্ড) আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (১৯৯৩) এবং ব্রিসবেন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (১৯৯৪) এ চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের জন্য মনোনীত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্য এক সত্য নির্মাণ করে 'একাত্তরের যীশু'।

ডেভিড প্রণব দাস খ্রিস্টকে দেখেছেন প্রচলিত ধর্মীয় ছাঁচের বাইরে গিয়ে। খ্রিস্ট সম্বন্ধীয় প্রযোজনা যেমন রবীন্দ্রভাষ্যে নির্মিত যিশুর জীবনালেখ্য নৃত্যনাট্য 'এসেছে জ্যোতির্ময়' (২০১৭) এ খ্রিস্টকে বিনির্মিত হতে দেখি সেখানে খ্রিস্টের প্রকাশ বহুমাত্রিক। এছাড়া 'ঐ মহামানব আসে', 'শরণম', 'স্তবে তুমি, স্তুতিতেও তুমি' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিবছর বড়দিন ও ইস্টারকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রযোজনা এবং ভাবনায় নির্মিত নাটকগুলোতে ছিল মানবতার বার্তা। টেলিভিশন প্রযোজনা ছাড়াও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও লেখালেখির সাথে যুক্ত ছিলেন আমৃত্যু। সংস্কৃতিচর্চা ছাড়া মুক্তবুদ্ধি ও সত্তার বিকাশ যে কখনো সম্ভব নয় সে বাণী ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর প্রতিটি কাজে। তারুণ্য, তরুণ এবং নতুনকে বিকশিত করবার সাহস ছিলো তাঁর। (ডেভিড প্রণব দাস, ২০১৭)

দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে অগণিত মানুষের আত্মত্যাগে সৃষ্ট একটি স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণে এগিয়ে এসেছে সবাই কিন্তু বিনির্মাণে অংশগ্রহণ সীমিত। দেশের জন্মলগ্ন থেকে নিজেদের জীবনাবসান পর্যন্ত এ দুজন ছিলেন সেই বিনির্মাণের অংশীদার যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। হিরণ্ময় দ্যুতিতে তাঁরা আলো ছড়িয়েছেন সৃষ্টির আনন্দে। শিল্পীর যে তৃতীয় নয়ন থাকে সে সত্য প্রকাশিত স্বমহিমায় প্রতিটি কাজে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

আলবার্ট ছোটন দাস, ঝর্না রোজারিও এবং ইলোরা জাস্টিন দাস

তথ্যসূত্র

১। সুলতানা, নার্গিস (২০২০) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীতশিল্পীদের ভূমিকা। *থিয়েটার জার্নাল* (৩) পৃ. ১১১। রাজশাহী:
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২। মোহাম্মদ, কেয়াল (২০১৫) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী

৩। আলবার্ট ছোটন দাস। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২ অক্টোবর, ২০২১

৪। ডেভিড প্রণব দাস। ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, ২০১৭

৭১- এর মুক্তির রণাঙ্গনে হানাদার বাহিনীর আতংক "জর্জ বাহিনী"

ফাদার আন্তনী সেন

ভূমিকা : ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পাক-বাহিনীর বর্বরতা ও হিংস্র আগ্রাসী আক্রমণের কড়াল থাবা থেকে দিনাজপুরকে তথা পবিত্র মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত করার শপথ নিয়ে স্থানীয় যে কয়জন সামরিক বেসামরিক বাহিনীর কর্ম কর্তাগণ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে মুক্তিকামী জনগণকে সংগঠিত করে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে শত্রু মোকাবিলা করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের মধ্যে সে সময়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ই.পি.আর, মিঃ জর্জ দাস হলেন অন্যতম (জর্জ ভাই)। ই, পি, আর, হওয়ায় রণকৌশল তার কাছে অজানা কিছু

ছিল না। তিনি নিজস্ব মেধা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মুক্তি বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তৎকালিন ই.পি.আর বাহিনীতে যোগদান করে সফলতার সহিত ট্রেনিং প্রাপ্তির পর পর্যায়ক্রমে ১১ বছর সুনামের সংগে চাকুরিকালে খেলাধুলায় সফলতা ও ভাল কাজ এবং অমায়িক আচার আচরণের কারণে পদোন্নতি মূলক ল্যান্স নায়েক হন। জর্জ ভাইয়ের অসীম সাহস, দৃঢ় মনোবল দেখে শত শত যুবক অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশ প্রেমিক যুবকেরা জর্জ ভাইয়ের কাছে দিনাজপুর ষ্টেডিয়াম,বালুয়াডাঙ্গা ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গের শিববাড়ি হামজাপুর সাব সেক্টর নং - ৭ এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অতঃপর পিতা মাতা, পরিবার পরিজন ও নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দেশের স্বার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে শত্রু মোকাবেলায় জর্জ ভাইয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও মেধাবী। জর্জ বাহিনী নামটি হানাদারদের কাছে ছিল অতি ভয়ের ও আতংকের। জর্জ বাহিনীর অস্ত্রের মুখে শতশত শত্রু সেনা নিহত হয়েছে। পাক সেনাদের ক্যাম্প, আস্তানা ও টাওয়ার গুড়িয়ে দিয়েছেন এই ভয়ংকর জর্জ বাহিনী। আবার হারিয়েছেন নিজের দলের কতিপয় যুবা যোদ্ধাকেও। অবশেষে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে দেশে অন্যান্য বীর যোদ্ধাদের মতো যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে জর্জ বাহিনীও বীর দর্পে লাল সবুজের পতাকা দিনাজপুরের অকাশে উড়িয়েছেন।

জর্জ ভাইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

বীর যোদ্ধা শ্রদ্ধেয় জর্জ দাসের জন্ম ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে। বিরল উপজেলার আহুটিয়া গ্রামে। পিতা ও মাতা যথাক্রমে পিটার ডি.সি দাস ও মোশেফিনা দাস (উভয়ে মৃত)। নয় ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার বড়। তিন ভাই মারা গেছেন । তিনি স্ত্রী, চার কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। পুত্র সন্তান মুক্ত শিমসন দাস নৌবাহিনীর উচ্চ পদস্থ রাংকের একজন কর্মকর্তা। তিনি ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ৫/১/১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের মনোনীত কর্মকর্তা প্রোগ্রাম কো- অর্ডিনেটরের পদ মর্যাদায় রাজশাহী বিভাগীয় যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের জরিপ ও কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং পুর্নবাসন কেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করেন। দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় যুগ যুগে পড়ে থাকা কড়াই বিলের ৫৬'১০ একর জমির উপর কৃর্ষি শিল্পের একটি স্কীম নিজ উদ্যোগে বাস্তবায়ন করেন। এ স্কীম থেকে বেশ কিছু যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার উপকৃত হচ্ছেন। তিনি ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুরের স্থানীয় স্কুল কলেজে সামরিক শিক্ষক হিসাবে বি.সি.সি, ও জে.সি.সি ক্যাডেটগণের প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়া তিনি দিনাজপুর জেলার বালুবাড়ী মহিলা বহুমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সহযোগিতা করেন।

জর্জ দাসের পরিচয়ের সাথে তার বাকী আরো চার বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের সমন্ধে দু এক কথা না লিখলেই নয়, নতুবা পরিচয়টি অসম্পর্ণ রয়ে যাবে। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনি সহ আরেক মুক্তি যোদ্ধা ভাই জন এস, কে, দাস মারা গেছেন। বর্তমানে তার আরো তিন মুক্তিযোদ্ধা ভাই বেঁচে আছেন। তারা হলেন মিঃ লুইস জেমস, এম, দাস যিনি জর্জ ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ ও সক্রিয় সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনি একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা তার পায়ে এখনো শেলের আঘাত আছে। তিনি ও জর্জ ভাই প্রথম দিনাজপুর জেল কারাগারের তালা ভেঙ্গে বাংগালী কয়েদীদের মুক্ত করে দেন। আনন্দের আর গৌরবের ব্যাপার হলো যে লুইস দাস অস্ত্র তাক করে শত্রুর দিকে তাকিয়ে আছেন এমন একটি ছবি ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে প্রতি কয়েক মিনিটের ব্যবধানে

ডিসপ্লে হচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা রবার্ট আর, এন, দাস যিনি মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকারের রিলিফ অফিসার হিসাবে কাজ করেছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা এন্থনী এন, এন, দাস তিনি পরিবারে সবার ছোট। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি কলেজের ছাত্র। এ সময়ে বড় ভাই জর্জ দাসের কাছেই শিবরাড়ি ক্যাম্পে ট্রেনিং নেন। কুঠিবাড়ি দখল করার সময় বড় ভাই জর্জ দাস ও লুইস দাসের সাথে তিনিও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ছিলেন।

দিনাজপুর কুঠিবাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা :

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে সারা পূর্ব পাকিস্তানে যখন রাজনৈতিক অবস্থা চরম মারমুখী এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে চরম টান টান উত্তেজনা ও অসহনীয় স্নায়ু যুদ্ধ চলছে এমন সময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ মার্চের

ঐতিহাসিক জ্বালাময়ী ভাষণে; বজ্র কণ্ঠে বলেন," প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল--- যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর। জয় বাংলা!" বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর ঢাকা ও চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। দিনাজপুরেও সেই যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল পাকিস্তানীদের দুর্জয় ঘাঁটি কুঠিবাড়ি ব্যারাক থেকে। বলা যায় "২৮ মার্চ দিনাজপুরে কুঠিবাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার উদ্বোধনীর দিন। বস্তুতঃপক্ষে কুঠিবাড়ি ব্যারাকের বাংগালী জোয়ানগণের আক্রামণাত্মক শক্তি শৌর্যের ভূমিকা দিয়েই দিনাজপুরে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়।"[২৪৩]

কুঠিবাড়ি আক্রমণের সময়ে দিনাজপুরের দামাল ছেলে জর্জ ভাই ও তার চার ভাই কুঠিবাড়ি ক্যাম্পে বিদুৎ গতিতে প্রবেশ করে অস্ত্রাগার নিজেদের আয়ত্বে আনে। তিনি পাকিস্তানি সেনাদের প্রধান ঘাঁটি কুঠিবাড়ি দখলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। "এ সময়ে শত শত জনতা জীবন বাজি রেখে নদী পার হয়ে গ্রাম থেকে ছুটে এসে কুঠিবাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেন। লাঠিসোটা নিয়ে উৎক্ষিপ্ত জনসাধারণের মানব বন্ধনে অবরুদ্ধ হয় পাকিস্তানিদের দুর্জয় ঘাঁটি কুঠিবাড়ি। কাঞ্চন নদীর এপার ওপার এলাকাব্যাপি ক্রুদ্ধ জনতার ভীড়ে ভরপুর হয়ে যায়। শুরু হয় কুঠিবাড়ির অস্ত্র শস্ত্র লুন্ঠন। জর্জ ভাই ও লুইস জেমস, এম, দাস হাতুরী শাবল দিয়ে অস্ত্রাগারের তালা ভেঙ্গে ফেললে নির্ভয়ে গ্রামবাসীরা ভারী ভারী অস্ত্র শস্ত্র কাঁধে করে নদীর পশ্চিম পাড়ে ককৈডাঙ্গা গ্রামে সরিয়ে এনে জমা করে। সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলির ভারী বাক্সগুলি কয়েক জনে মিলে ধরাধরি করে অনায়াসে নদীর পশ্চিম পারে এনে জমা করেন। সেখানে পাকবাহিনীর গোলাগুলিতে বেশ কয়েক জন বাংগালী নিহত হন। সে সময়ে যে কয়জন শীর্ষ স্থানীয় নেতা কর্মী উপস্থিত থেকে বিপ্লবীগণের তদারকীর দায়িত্ব পালন করেন তাদের মধ্যে জর্জ ভাই এক জন। এছাড়াও শহরের বাইরে চতুর্দিকের গ্রামগুলি থেকে ছুটে আসা মুক্তি সংগ্রামী যুবকগণও ছিলেন। তন্মধ্যে বিশিষ্ট যারা তাদের মধ্যে রবার্ট এন, এন, দাস , মিঃ লুইস জেমস, এম, দাস, জন এস,কে, দাস ও এন্থনী এন,এন, দাস।"[২৭২-২৭৩]

দিনাজপুরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা কমিটি গঠন : দিনাজপুরে যখন মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়, জর্জ দাসকে সেখানে প্রশিক্ষক হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। "আওয়ামী লীগ দলভুক্ত ও আওয়ামী লীগ বহির্ভূত যে সমস্ত প্রভাবশালী দলনেতা কর্মী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার মধ্যে আবির্ভূত হন তাদের মধ্যে বর্ষীয়ান নেতা দূর্গা মোহন রায় (প্রাক্তন এমপি) ডাঃ নইমউদ্দিন আহমদ, এডভোকেট আমজাদ হোসেন, এডভোকেট আজিজুল ইসলাম জগলু, ন্যাপপন্থী নেতা গোলাম রহমান, ভাষানী পন্থী নেতা এস, এ,বারী, তেভাগা নেতা গুরু দাস তালুকদার, কমিউনিষ্ট নেতা রফিক চৌধুরী, জনগনের নেতা হবি চেয়ারম্যান, ছাত্র নেতা এম, এ, তোয়াব, আসলেহ ভাই,ভাদু ভাই, তানু ভাই, দলিল ভাই, জর্জ ভাই, ছুটু ভাই মাহতাব সরকার ও আরো অনেকে।" [২৪৯]

প্রশিক্ষক জর্জ দাস : ৭ মার্চের পর থেকেই শুরু হয় আন্দোলনের পথ ছেড়ে আক্রমণ প্রস্তুতির অভিযান। শহরে মিটিং মিছিল ছাড়াও যুদ্ধোন্মুখ যুবকগণ সমন্বয়ে শহরের টেডিয়ামও বালুয়াতাঙ্গাতে গেরিলা গুপ্ত ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়। এ মহান কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় জর্জ ভাইকে। তিনি নিষ্ঠার সাথে কমপক্ষে পাঁচ শত যুবককে প্রশিক্ষণ দেন মার্চ ১৯৭১ হতে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। সেই সাথে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধ যুদ্ধে সঠিক সফল নেতৃত্ব দেন। ১৩ এপ্রিল হানাদার বাহিনী যখন দিনাজপুর ঢুকে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়, ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে, নারী নির্যাতন করে ও বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে এক বিভীষিকা সৃষ্টি করে। জর্জ ভাই তখন তার বাহিনী নিয়ে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে শত্রু সৈন্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন। তার মেজ ভাই লুইস দাস বলেন, ১২ এপ্রিল যখন দশমাইলে হঠাৎ যুদ্ধ শুরু হয়, জর্জদার আহবানে আমরা একটি ২০/২৫ জনের ছোট দল টাংক, মর্টার ও কামানের গুলি বর্ষণের মুখে মৃত্যুকে তোয়াক্কা না করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

হামজাপুর শিববাড়ি : জর্জ ভাই ১৪ এপ্রিলের পর ভারতে শরণার্থী শিবিরে যান। সেখানে সীমান্ত সংলগ্ন হামজাপুর শিববাড়ী (গঙ্গারামপুর) এলাকায় প্রাথমিকভাবে পাঁচ শতেরও বেশী

মুক্তিকামী যুবকদের সংগঠিত করে ইয়োথ ক্যাম্প গড়ে তোলেন। তিনি যুবকদের যুদ্ধে যোগদান করার জন্য প্রতিটি যুবকের কাছে গিয়ে অনুরোধ করতেন, অনুপ্রাণিত করতেন, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর সোহাগ করে বলতেন, বাবা চল দেশকে দেশের মাটিকে আমাদের মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করি। তার ডাকে অনেকেই সাড়া দিয়েছেন আবার অনেকেই প্রাণের ভয়ে দূরে সরে গেছেন। এই দল মুজিবনগর সরকারের ৭নং সেক্টরের আওতায় কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি এই ক্যাম্পের প্রশিক্ষক ও ইনচার্জ ছিলেন ।

জর্জ বাহিনীর গেরিলা যুদ্ধ : দিনাজপুরে জর্জ দাসের নেতৃত্বাধীন মুক্তি বাহিনীর পরিচিতি ছিল "জর্জ বাহিনী" নামে। তিনি তার বাহিনী নিয়ে সরাসরি গেরিলা যুদ্ধ করতেন। তার বাহিনীর দুঃসাহসিকতায় পাকিস্তানি সেনারা সর্বদা ভীত, সন্ত্রস্ত ও

তটস্থ থাকত। ৭ নং সেক্টরের হামজাপুর সাবসেক্টর জর্জ বাহিনী হানাদার বাহিনীর কাছে ছিল এক বড় আতংক। শত্রু পক্ষের কাছে প্রতি মুহূর্তে তিনি ছিলেন ত্রাসের কারণ। জর্জ ভাই ও তার বাহিনী মূলত গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধক্ষেত্র গুলো হচ্ছে: দিনাজপুরের দশমাইল, কুঠিবড়ি, বিরলের বহবল দিঘি, গোয়ালবাড়ি, ধর্মপুর, রামসাগর,খানপুর, ঘুঘু ডাঙ্গা, কালিয়াগঞ্জ, সরস্বতীপুর, হাকিমপুর সহ বিভিন্ন এলাকার অপারেশনে হানাদান বাহিনীর প্রায় এক হাজারের বেশী প্রাণ যাওয়ায় জর্জ বাহিনী নামটা বেশী করে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে আতংক এমন ভাবে বিরাজ করছিল যে, যখন তখন ম্যুভ করার সাহস হারিয়ে ফেলেছিল পাকবাহিনী। তিনি ও তার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোদ্ধারা সাধারণভাবে জর্জ বাহিনী নামে পরিচিতি পায়। কাগজে কলমে জর্জ বাহিনী না থাকলেও জর্জ দাসের নেতৃত্বাধীন মুক্তি বাহিনীর দুঃসাহসিক অভিযানে পাকিস্তানি হানাদারদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়, যা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দিনাজপুরে বাংগালীদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে অবদান রাখে।

জর্জ ভাইয়ের মাথার দাম ৫০ হাজার টাকা ঘোষণা : মিঃ এন্টনী এম. এন. দাস (বীর মুক্তিযোদ্ধা) জর্জ ভাইয়ের সর্ব কনিষ্ট ভ্রাতা। তিনি বলেন, জর্জদা ছিলেন আপোষহীন, নিরলস দুঃসাহসিক একজন বীর যোদ্ধা। আমার দৃষ্টিতে তিনিই ছিলেন একজন প্রকৃত যোদ্ধা। তিনি নির্বিঘ্নে শত শত শত্রু হত্যা করেছেন। দলকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। হানাদার বাহিনীর কাছে তিনি এতটাই ভয়ংকর ও আতংকের কারণ ছিলেন যে, হানাদানবাহিনী জর্জ ভাইয়ের মাথার দাম ঘোষণা দিয়েছিলেন ৫০ হাজার টাকা। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলাম কিন্তু কেন তাকে হত্যা করা হলো। তিনি বেঁচে থাকলে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা সন্মান পেত।

মিঃ লুইস জেমস এম দাস (বীর মুক্তিযোদ্ধা) তিনি বলেন, আমি সব সময়ে তার সাথে থেকে যুদ্ধ করেছি পয়েন্টে পয়েন্টে আক্রমণ চালিয়েছি। জর্জ ভাইয়ের নেতৃত্বে দিনাজপুরের বিরল বহবল দিঘী থেকে কালিয়াগঞ্জ, ঘুঘু ডাংগা, দিনাজপুর সদর রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রাথমিকভাবে যুদ্ধ শুরু করি। দিনাজপুর জেল কারাগারের তালা ভেঙ্গে আমি ও জর্জ ভাই কয়েদীদের বের করে আনি। সে সময়ে জর্জ ভাইয়ের চেখে মুখে দেশকে মুক্ত করার নেশা। বহবল দিঘীতে শিমূল গাছে স্থাপিত পাক বাহিনীর অবজারভেশন পোষ্ট এবং পাক বাহিনীর ক্যাম্প ধ্বংস করে দেই। জর্জ ভাইয়ের নেতৃত্বে অল্প সময়ের মধ্যে পাকবাহিনীর সংগে ঘুঘুডাঙ্গা, ঘাশিপাড়া ও মিশন রোডে যুদ্ধেও মুখোমুখি হই এবং নির্বিচারে গুলি চালিয়ে শত্রু পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দেই। জর্জ ভাই যুদ্ধক্ষেত্রে একজন বিচক্ষণ কমান্ডার ছিলেন। যুদ্ধে যাওয়ার আগে তিনি তিক্ষ্ণতার সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে অপারেশনে নামতেন।

আলব্রিকুশ হাঁসদা (ঘোড়াঘাট, ওসমানপুর, দিনাজপুর) জর্জ ভাই সমন্ধে তিনি বলেন, শিববাড়ি হামজাপুর ইয়োথ ক্যাম্পে জর্জ ভাইয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। তার মতে ৪,৮৭২ জন যুবক বিভিন্ন মেয়াদে ১০/১৫ দিন কেউ আবার এক সপ্তাহ প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে গেছেন। জর্জ ভাই আমার আইকন। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সাহসী ও দুঃধর্ষ্য এক যোদ্ধা। তার রণকৌশল ছিল অত্যন্ত সাজানো গুছানো। প্রশিক্ষক হিসাবেও ছিলেন দারুণ। মুক্তিযোদ্ধা যুবকদের ছেলের মতো দেখতেন। ট্রেনিংকালে আদর যত্ন করতেন, ভালবাসতেন, মনে উৎসাহ উদ্যিপনা ও সাহস জোগাতেন। দিনাজপুর দখলে মুখ্য ভূমিকা ছিল জর্জ বাহিনীর। জর্জ বাহিনীর যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল বেশী। যুদ্ধকালীন তার ভূমিকা মেজর ও উর্দ্ধতন কর্মর্কতাদেরও চেয়ে উর্দ্ধে ছিল। রণাঙ্গনে শত্রু মোকাবেলায় তার রুপ ছিল অতি ভয়ংকর ও আগ্রাসী। তার সাহসিকতা দেখে আমরাও শত্রুকে ঘায়েল করার প্রচুর সাহস পেতাম।

মিঃ লরেন্স নরেন মার্ডী (বেলপুকুর, পাচঁ বিবি, জয়পুরহাট) জর্জ ভাইয়ের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদানের জন্য যুবকদের কাছে গিয়ে অনেক সাধাসাধি করতেন, অনুরোধ করতেন। এতে আমরা অনেকেই তার ডাকে সাড়া দিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসেছি। আবার

অনেকেই যুদ্ধের ভয়ে তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি। আমি জর্জ ভাইয়ের কাছে ট্রেনিং লাভ করেছি। যুদ্ধে তিনি আমাদের বিভিন্ন দলে দলে ভাগ করে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করতেন। তার চোখে মুখে ছিল দেশকে মুক্ত করার চরম উদ্যম ও আগ্রহ। যোদ্ধা হিসাবে তিনি ছিলেন বড়ই ভয়ংকর, সাহসী ও তেজস্বী। যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে তার নির্দেশনা ও কৌশলগত দিকগুলো মেনেই গোটা টিম যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হতাম। আক্ষেপ করে বলতে হয় এই নির্ভিক, দুঃসাহসিক, এক জন খাঁটি নিষ্ঠাবান, সৎ দেশ প্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশে যথাযথ সন্মান, মর্যাদা ও মূল্য পাননি। বুক ভরা হতাশা, নিরাশা, ক্ষোভ, আক্ষেপ নিয়ে তাকে মরতে হয়েছে।

আলফ্রেড একা (লোহানী পাড়া, বদরগঞ্জ, রংপুর) জর্জ ভাই সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক যুদ্ধের স্মৃতিই মানসপটে ভেসে উঠে। জর্জ ভাইয়ের অধীনে ট্রেনিং নিয়েছি। তার নেতৃত্বে যুদ্ধে গিয়েছি, যুদ্ধ করেছি। তাকে রাগ করতে দেখিনি। ঠান্ডা মাথায় দল পরিচালনা করতেন। পাক সেনাদের আক্রমণে তার ক্ষীপ্রতা, তেজস্বীতা ও দুঃসাহসিকতা ছিল কল্পনাতীত। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার কৌশল ও সাহসিকতা আমাদের প্রচুর অনুপ্রেরণা জোগাতো। আমি এই স্বাধীন বাংলাদেশকে গর্ব করে উচ্চ কণ্ঠে বলতে চাই, জর্জ ভাই হলেন মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযোদ্ধা। জর্জ ভাইয়ের নিজ হাতে গড়া দুঃধর্ষ মুক্তিবাহিনীকে লোকে বলত 'জর্জ বাহিনী'। এই বাহিনীতে যুক্ত হওয়ায় নিজেকে ধন্য মনে করছি।

মাইন ও অস্ত্র উদ্ধার : বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানী সেনাদের ফেলে যাওয়া, পুঁতে রাখা, লুকিয়ে রাখা অস্ত্র উদ্ধারেও জর্জ দা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। দিনাজপুরে ফেলে রাখা হয়েছিল বিভিন্ন রকম মাইন। তিন রকমের মাইন আছে- এন্টি ট্যাংক মাইন, এন্টিপার্সন মাইন ও জাম্পিং মাইন। এই মাইন গুলো তোলার জন্য তখন ইন্ডিয়ান আর্মিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মাইনগুলো এমনভাবে প্লাস্টিকের কন্টেইনারে মুড়ে রাখা হয় যে, কোন বিশেষজ্ঞ ছাড়া তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তারা বলল, "কহি পেভি মাইন নেহি হ্যায়।" কিন্তু কিছু দিন পর যত্র তত্র মাইন দুর্ঘটনা ঘটতে শুরু করল। তখন জর্জ ভাই এগিয়ে এলেন, একা। তার মাইন বিষয়ক একটি চাইনিজ ট্রেনিং ছিল। তিনি নিরলস প্রচেষ্টায় মাইনগুলো তুললেন। চার ট্রাক মাইন তোলা হলো তার নেতৃত্বে।" তিনি দিনাজপুর ছাড়াও পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও এলাকাতেও মাইন অপসারণের কাজ করেছেন।

উপসংহার: দিনাজপুরের দামাল ছেলে জর্জ ভাই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস অব্দি দেশকে হানাদার বাহিনীর বর্বর আক্রমণ থেকে মুক্ত করার লক্ষে লড়ে গেছেন। মুক্তিকামী যুবকদের নিয়ে দিনাজপুরকে শত্রু মুক্ত করেছেন। এটা তার জীবনের জন্য চরম পাওয়া ও স্বার্থকতা । তিনি ও তার বাহিনী দেশকে শত্রু মুক্ত করার জন্যে যে জীবন-মরণ যুদ্ধ করেছেন তা বাংলার ইতিহাসে যুগে যুগে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যুদ্ধের ময়দানে তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সাহসী, দূরদর্শী ও দুঃধর্ষ, ভয়ংকর এক যোদ্ধা। যার নামে ও আক্রমণে শত্রু পক্ষ হতবিহ্বল হয়ে পড়ত। হানাদার বাহিনীর কাছে তিনি ছিলেন বড় আতংকের। স্বাধীন বাংলাদেশ ও বিশ্বে স্বতন্ত্র একটি মানচিত্র গড়ার পেছনে জর্জ বাহিনীর অবদানের জন্যে দিনাজপুরবাসী তার কাছে চির কৃতজ্ঞ। তাঁর মহান ত্যাগের কথা সবাই আজীবন শ্রদ্ধার সাথে মনে রাখবে। রণাঙ্গনের এই মহানায়ক তার সমর কৃতিত্বের জন্য দিনাজপুরের মাটিতে তথা চির সবুজের সোনার বাংলায় অমর হয়ে থাকুন চিরদিন, চিরকাল। জয় বাংলা!

সহায়ক গ্রন্থ

১। মেহরাব আলী, দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র - ৫ দিনাজপুর শহর ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি - ২০০০ (পৃঃ ২৪৮- ২৪৯, ২৭২-২৭৩)।

২। রোনাল্ড দেবাশীষ দাশ, মুক্তিযুদ্ধে জর্জ বাহিনীন অবদান ও মহানায়ক জর্জ দাশ -২০১৭ (পৃঃ ৪৩)।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রয়াত জর্জ ভাইয়ের পত্নী ঝর্ণা দাশ, মিঃ লুইস জেমস এম, দাশ, রবার্ট আর, এন, দাশ, এন্টনি এন, এন, দাশ।

সংগ্রাম, গৌরব ও অর্জনের মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ ও সাফল্য

মিথুশিলাক মুরমু

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ বিভাগের পরবর্তীকালেই এতদ্‌অঞ্চলের অধিবাসীরা উপলব্ধি করেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ব বাংলার)-এর জনসাধারণকে কখনোই উন্মুক্ত আকাশে বিচরণ করতে দেবে না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান-এর উপলব্ধিতে তিনটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছিলো–'এক. পূর্ববাংলার মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র মুসলিমরা যে আর্থিক মুক্তির জন্য পাকিস্তান চেয়েছিলেন, সে পাকিস্তান হয়নি। দুই. লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী না হয়ে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের নিয়মবহির্ভূত একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। তিন. এই রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে গিয়ে ধর্মের নামে যে নরহত্যা হয়েছে তা শুধু অমানবিক নয়, চিরস্থায়ী এক ক্ষত।'[১] সাতচল্লিশ থেকে সত্তর মাত্র ২৪ বছরেই নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছে। ২৪ বছরের সংগ্রামে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে দেশের আদিবাসীরা আন্দোলনে সামিল, সংহতি এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। মং রাজা মংপ্রুসাইন স্বাধিকার আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের শ্রী সাগরাম মাজহী (হাঁসদা) ছাড়াও রাখাইন নেতা তৈনজাই মাষ্টার স্বাধীনতা সংগ্রামকালে পটুয়াখালী'র কলাপাড়া ও আমতলী থানা সংগ্রাম পরিষদের দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। যে যার অবস্থান থেকে বৈষম্য, বঞ্চনা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন ক্রমাগতভাবে। স্বাধীনতার পথ পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করেছেন। কক্সবাজার এলাকার রাখাইনরা গর্ব করে থাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বিপদাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে স্থান ও আতিথ্যের সুযোগদানে। 'বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পলাতক অবস্থায় কক্সবাজার জেলা সার্কিট হাউজ পাহাড় সংলগ্ন বাহারপাড়া বৌদ্ধ বিহারে বেশ কয়েকদিন যাবৎ আত্মগোপন করেছিলেন। বিহারাধ্যক্ষ উ চান্দিমা মহাথেরো (প্রয়াত) বিশেষ সতর্কতার সাথে বঙ্গবন্ধুকে সেবাযত্ন করে শত্রু থেকে আড়াল করে রাখেন। এটা কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাখাইনদের অবিস্মরণীয় অবদান নয়?[২]

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রয়েছে– অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের অত্যন্ত কৌশলীপূর্ণ বক্তব্যে মোহিত হয়েছে সর্বস্তরের জনসাধারণ, যুদ্ধের ময়দানে যেতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি বলেছেন–'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়'। নিশ্চয়ই আদিবাসীরা বাংলার বাইরে নয়! বাংলায় বসবাসরত আদিবাসীরা জননেতার ডাকে সাড়া দিয়ে দৌড়ে বেরিয়েছে অধিকার লড়াইয়ের জনস্রোতে। আদিবাসীরা যুদ্ধের সম্মুখ সারিতে থেকে লড়েছেন, আহত, পঙ্গুত্ব এবং শহীদ হয়েছেন। শত্রু কবলিত মা-মাটি-দেশকে মুক্ত করেছেন, মুক্ত করেই প্রত্যাবর্তন করেছেন জন্মভিটাতে। অনেকেরই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আজো স্বীকৃতি মেলেনি, তবুও দেশের মাটির সাথে, মানুষের সাথে বেঈমানী করেনি। একজন সুনাগরিক হিসেবে শত্রুসেনাকে উৎখাত করার নৈতিক দায়িত্ব পালন করেছে কিন্তু রাষ্ট্র তার প্রতিদান বা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের পবিত্র সংবিধানের প্রস্তাবনায় লিপিবদ্ধ করেছেন–'আমরা বাংলাদেশের জনগণ' অর্থাৎ মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, আদিবাসী-অন্ত্যজ সর্বশ্রেণীর মানুষের অবদানকে স্মরণীয় করেছেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত সংবিধানে আমার দেশের নামকরণ করা হয়েছে–গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এ কতোটি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বসবাস করছে এটির সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তবে এটি নিশ্চিত করেই বলা যায়, আদিবাসীরা যে যার অবস্থান থেকে শত্রুসেনাকে পরাভূত করতে হাতে তুলে নিয়েছিলো অস্ত্র। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র দু'দিন পরেই উত্তরবঙ্গের শহর রংপুরে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছিল বাঙালি হিন্দু-মুসলমান, আদিবাসী সাঁওতাল-উরাঁওসহ হাজার হাজার মানুষ। ২৮ মার্চ রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাওয়ে আদিবাসীরা লাঠিসোটা, তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম, টাঙ্গি নিয়ে অগ্রগামী হয়েছিলেন, সঙ্গে আরো ছিলো দেশপ্রেমের উল্লসী চেতনা। সেদিন বলদিপুকুর, লোহানীপাড়া, বকরাম, শেখপাড়া ইত্যাদি গ্রামগুলো থেকে শুধু পুরুষেরা নন, আদিবাসী মহিলারাও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। নারীর সাহসে সাহসিত হয়েই পুরুষেরা পাকিস্তানী বাহিনীকে মোকাবেলা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'রংপুরের উপকণ্ঠে পাকফৌজ দু'শ সাঁওতালকে হত্যা করেছে। তাদের ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে দিয়েছে'।[৩] মুক্তিযুদ্ধে মরণাস্ত্রের বিপরীতে আদিবাসীদের তীর ধনুকের সেই স্মারক স্মৃতিই বহন করে চলেছে 'অর্জন' ভাস্কর্যটি। ভাস্কর্যশিল্পী অনীক রেজার সৃষ্টিকর্ম। এটিকে বলা হচ্ছে স্বাধীনতার স্মারক। ১৯৯৯ সালে ২৪ জুলাইয়ে ভাস্কর্যটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্যে তীর-ধনুক কেন, কৌতুহলী কোনো পথচারীর মনে এ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে, যদি কেউ রংপুরের বাইরে থেকে সেখানে গিয়ে থাকেন। কিংবা যার জন্য একাত্তরের পরে, মুক্তিযুদ্ধের সময়

কী ঘটেছিল রংপুর এলাকায়- এ সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নন, তার মনেও এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। 'অর্জন' বিষয়ে রংপুরের জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় দেখা যায়, এটি শিল্পী অনীক রেজারই ব্যাখ্যা- স্তম্ভের মূল কাঠামোটি তীর-ধনুক ফর্ম থেকে নেয়া। এই বাঁকানো ফর্মটি এবং দণ্ডায়মান স্তম্ভ দুটি উপস্থাপন করবে তীর এবং ধনুক, যা কিংবদন্তি তুল্য রংপুরের জনগণের তীর-ধনুক নিয়ে সেনানিবাস আক্রমণ এবং শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা উপস্থাপন করবে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুক্ত আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা নির্ধারণ খুবই কঠিন কাজ। শুধুমাত্র রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানাতেই ৬২ জন আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধার তালিকা পাওয়া যায়। 'দিনাজপুর জেলার ওরাঁও ও সাঁওতালদের ১০০০ জনের সমন্বয়ে বিশাল মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলো।[৪] ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, নেত্রকোণা এলাকার গারো হাজং, কোচ জনগোষ্ঠীগুলো থেকে প্রায় পনেরশত আদিবাসী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১১৫ জন ছিলো শুধুমাত্র হালুয়াঘাট এলাকা থেকেই। বিষ্ণুপ্রিয়া মুনিপুরীদের মধ্যেই কমপক্ষে ৫০ জনের অধিক সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। দেশে বসবাসরত কম-বেশি প্রায় প্রতিটি জনগোষ্ঠী থেকেই সূর্য সামিল স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতে সম্মুখ সমরের মুখোমুখি হয়েছেন।

আদিবাসী অহমিয়া'রা সংখ্যায় স্বল্প, পার্বত্য এলাকায় বসবাস করেন। '১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কিছু সংখ্যক অহমিয়া ব্যক্তি যারা তখনকার সময়ে পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত ছিল, তারা প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।[৫] মহান মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী খিয়াংদের সমর্থন ছিলো শতভাগ। '১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে খিয়াংরা মুক্তিবাহিনীকে নানাভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে সহায়তা দিয়েছিল। ভৌগোলিকভাবে খিয়াং অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমানা বরাবর ও পর্বতসঙ্কুল। এই ভৌগলিক অবস্থা মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা যুদ্ধের জন্য ছিল অনুকূল ও নিরাপদ। এসব জায়গায় খিয়াংরা মুক্তিবাহিনীর জন্য এক নিরাপদ আস্তানার ক্ষেত্র গড়ে তুলেছিল। পাশাপাশি হানাদার বাহিনীর গতিবিধি ও তাদের কৌশলগত অবস্থান সম্বন্ধে মুক্তিবাহিনীর শিবিরে পৌঁছে দেয়ার মতো চরম ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও অনেকে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন–ধমকি খিয়াং, থইগ্য খিয়াং, বাসু খিয়াং, সাপ্রু খিয়াং ও চেইথইউ খিয়াং।[৬] আড়ালে থাকা গুর্খা আদিবাসীরা অমিত সাহসের সাথে যুদ্ধ করেছেন। 'শহীদ গুর্খা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে লাল বাহাদুর ছেত্রী, শান্তি বাহাদুর রায়, তেজ বাহাদুর ছেত্রী ও জেমস বাহাদুর ছেত্রীর নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। মুক্তিযোদ্ধা তেজ বাহাদুর ছেত্রী কুষ্টিয়ায় এবং মুক্তিযোদ্ধা জেমস বাহাদুর ছেত্রী চট্টগ্রামে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে আত্মত্যাগ করেন।[৭] নাইক্ষ্যংছড়ি'র চাক জাতিগোষ্ঠীর অবদানও অনস্বীকার্য। '১৯৭১ সালের মে মাসে বাইশারী হতে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দূরে আরাকান রোডের পার্শ্বে অবস্থিত পাল পাড়ার আনুমানিক ২০০ হিন্দু পরিবার (কিছু মুসলিম পরিবারও ছিল) জীবন রক্ষার তাগিদে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাইশারী মৌজার চাক পাড়ায় এসে আশ্রয় নেয়। ...রশিদ আহম্মদ মাতবর-এর ছোট ভাই প্রয়াত এমদান আহম্মদ, যিনি এককালে ছাত্রলীগেরও নেতা ছিলেন, হাতে ১টি রাইফেল নিয়ে গভীর রাতে মংমং চাকের বাড়িতে এসে হঠাৎ উপস্থিত হন। এ সময় মংমং চাক মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে সহায়তা প্রদান করেন।[৮] মুক্তিযুদ্ধে চাকমাদের অংশগ্রহণ বিষয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা ভাব রয়েছে। মূলতঃ তৎকালীন চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করায় এই বির্তকের জন্ম হয়েছে। অতঃপরও অনেক চাকমা যুবক মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছাত্র-যুবদের উদ্বুদ্ধ করেন মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে যেতে। আরেকজন নেতা কোকনদাক্ষ রায়সহ কয়েক 'শ চাকমাসহ জুম্ম ছাত্র যুবকরা মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে ত্রিপুরা রাজ্যে গমন করেছিলেন। যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রাক্কালে কোকনদাক্ষ রায়কে ত্রিপুরাতে গ্রেফতার করলে; ইতোমধ্যেই যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন এবং যারা প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, অনেকের মনোবল ভেঙে যায়। 'ফলে অনেক জুম্ম ছাত্র-যুবক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পেরে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফেরত আসে। তৎসময়ে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) বাহিনীতে চাকমাসহ অনেক জুম্ম ছিল। তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে রমণীরঞ্জন চাকমা রামগড় সেক্টরে পাকিবাহিনীর সাথে যুদ্ধে নিহত হন। সিপাহী হেমরঞ্জন চাকমা বগুড়া সেক্টরে নিখোঁজ হন। ... বিমলেশ্বর দেওয়ান ও ত্রিপুরা কান্ত চাকমাসহ ২০/২২ জন জুম্ম সিভিল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে বরেন ত্রিপুরা, কৃপাসুখ চাকমা, আনন্দ বাঁশি চাকমা ছিলেন অন্যতম।[৯] একদা মেজর জিয়াউর রহমান দলবলসহ নাকি চেঙ্গী নদী পার হতে চাইলেন। নদীতে হাঁটু পানি জল ছিলো, ভিজতে না চাওয়াই কমলছড়ি গ্রামের জনৈক মৃগাঙ্গ চাকমা পিঠে করে মেজরকে পার করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পাকবাহিনী সভ্য মহাজন (চাকমা), গৌরাঙ্গ দেওয়ান ও চিত্তরঞ্জন কার্বারীকে ধরে নিয়ে যায়; আজ পর্যন্ত কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। পার্বত্য অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীও পিছিয়ে থাকেনি– 'কোম্পানী কমাণ্ডার হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা পুরো এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধাসহ ১৯৭১ সালের ১৩ আগষ্ট তৎকালীন মহকুমা সদর রামগড়ের পাকবাহিনীর সদর দপ্তরে আক্রমণ করেন। ১০ সেপ্টেম্বর বর্তমান মানিকছড়ি উপজেলার ডাইনছড়ি চেঙ্গ পাড়া এলাকায় পাকবাহিনীর উপর এক গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করেন। হেমদারঞ্জন ত্রিপুরা এই মানিকছড়ি এলাকায় বেশ কয়েকবার পাক-বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে পাক-বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনসহ ১৩জন পাকহানাদার সদস্যকে খতম করে। মুক্তিযুদ্ধে আরো অংশগ্রহণ করেন রঞ্জিত ত্রিপুরা, রাজেন্দ্র ত্রিপুরা, রণবিক্রম ত্রিপুরাসহ বহু ত্রিপুরা

জনগোষ্ঠী। অপরদিকে বরেন ত্রিপুরা ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[২০] মহান মুক্তিযুদ্ধের মং রাজা মংপ্রুসাইন 'স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে শত শত লোক পরিবার-পরিজন নিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে যাচ্ছিল; তখন তিনি খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়িস্থ রাজবাড়িতে তাদের খাওয়া-দাওয়াসহ নানাভাবে সহায়তা করেন। পাক সেনারা রামগড় দখল করার পূর্বেই তিনি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়েও বসে থাকেনি। তিনি কর্ণেলের ব্যাজ পরে কুমিল্লার আখাউড়া সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা থেকে মংসাথোয়াইং (পানখাইয়া পাড়া), অদুং, কংজরি, উক্যজেন, মংসাথোয়াইং (গুইমারা)সহ মারমা জনগোষ্ঠীর অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা হলেন- চিংহ্লামং চৌধুরী, মংশৈপ্রু, মংশৈপ্রু প্রমুখ।[২১] বান্দরবানের ম্রো জনগোষ্ঠীর একমাত্র শহীদ মুক্তিযোদ্ধা লাংরে ম্রো সম্পর্কে অনেকেই অবগত নন। একাত্তরে পাক-হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে তিনি নিহত হন। 'বান্দরবান জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার আবুল কাশেম বলেছেন, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় লাংরে ম্রোয়ের নাম আছে। তাঁকে সম্মাননা জানানোর জন্য তাঁর পরিবারের কাউকে পাওয়া যায়নি।[২২]

কোচ আদিবাসীরাও মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তর্জনীর নির্দেশনা তাদেরকেও উদ্বেলিত করে তুলেছিলো। '১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সময় মুক্তিযুদ্ধে অনেক কোচ আদিবাসী অংশগ্রহণ করেন। বিনোদ বিহারী কোচ, নবীন কোচ, সুধাংশু কোচ, মহেন্দ্র কোচ, ইন্দ্রমোহন কোচ, শ্রীলাল কোচ।[২৩] আদিবাসী খাড়িয়ারা মূলতঃ চা বাগান এলাকায় বসবাসরত। সিন্দুরখান চা বাগানের শ্রমিক বন্ধু খাড়িয়ার বিধবা মেয়ে সালগী খাড়িয়া। যুদ্ধের ডামাডোলে পাকিস্তানী বাহিনীর শ্যেন দৃষ্টি পড়েছিলো সালগী খাড়িয়ার প্রতি, শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জ অঞ্চলের কসাই হিসেবে পরিচিত পাকসেনা শের খানের। অন্যদের থেকে দেখতে এবং শারীরিক গঠনে সুন্দরী হওয়ায় জোর করে তুলে নিয়ে বিয়ে করে শের খান। বৈবাহিক সম্পর্ক পাকিস্তানীদের প্রতি ঘৃণার মনোভাবকে কমাতে পারেনি। সালগী প্রতিনিয়ত ছলচাতুরী করে দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন কারণ তার হৃদয়েও ছিলো প্রতিশোধের অগ্নিমশাল। উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা শের খানের গতিবিধি তিনিও পর্যবেক্ষণ করতেন এবং মুক্তিযোদ্ধা বিশেষত বাগানের উদয় ভুঁইয়াকে খবর পৌঁছাতেন। সালগীর প্রচেষ্টায় রাজঘাট চা বাগানের উত্তম কুমার তাঁতী জীবন ফিরে পেয়েছেন। অত্র এলাকায় পাক সেনাদের হাতে কোনো ব্যক্তি ধরা পড়লে ডাক পড়তো সালগী খাড়িয়া'র। শের খান তার কাছ থেকে জানতে চাইতো, সে তাদের চেনে কি না কিংবা নিকট আত্মীয়-স্বজন কী না! বহু অপরিচিত লোককে পরিচিত এবং দূর-নিকটাত্মীয় বলে জীবন বাঁচিয়েছেন। ধলাই চা বাগানের একটি বটগাছের উপরে মাচায় বসে শের খান মাঝেমধ্যে সীমান্ত অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করতো। সালগী'র কাছ থেকেই তথ্য পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা শের খানকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিলো। স্বাধীন বাংলায় সালগী নিজ পরিবারে প্রত্যাবর্তন করেন।[২৪] আদিবাসী গারোদের উদ্যামতা সবচেয়ে বেশি ছিলো, মহান মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালেও অর্থাৎ ১৫ আগষ্ট, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সপরিবারকে নিশ্চিহ্ন করতে গণহত্যা চালালে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী'র নেতৃত্বে গারো মুক্তিযোদ্ধারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে বাঁচতে আপামর জনসাধারণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন। 'পরিমল দ্রং, আরং রিছিলের মতো বেশ কজন বীর গারো মুক্তিযোদ্ধা সম্মুখ যুদ্ধে শহীদও হয়েছেন। গারো মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কোম্পানি কমান্ডার দীপক সাংমা, মুক্তিযোদ্ধা থিয়রফিল হাজং, প্লাটুন কমান্ডার ধীনেন্দ্র রিছিল, প্লাটুন কমান্ডার যতীন্দ্র সাংমা, প্লাটুন কমান্ডার স্টেফান নকরেক, সেকশন কমান্ডার অন্দ্র মারাক, নারী মুক্তিযোদ্ধা ভেরেনিকা সিমসাং প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধার নাম উল্লেখযোগ্য।[২৫] সমতলের আদিবাসী ডালুরা যুদ্ধে পিছপা হননি। 'সে সময় ১১ নং সেক্টরের অন্যতম যুদ্ধ তেলীখালিতে সম্মুখ সমরে অংশ নিয়ে শহীদ হন চিত্তরঞ্জন ডালু (৭ শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ)। এছাড়া বিভিন্ন রণক্ষেত্রে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন হিটলার ডালু, রঘুনাথ ডালু, অমেন্দ্র ডালু ও রঙ্গলাল ডালু।[২৬] ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলোতে বানাই আদিবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিলো। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ও সাহসী ভূমিকা পালনের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা রকেট বানাইসহ আরো অনেককেই জাতি আজও সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে থাকে।[২৭] এদেশের সার্বভৌমত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে শতাধিক হাজং মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কলাবতী হাজং কমিউনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে ভারতে গমন করেন এবং সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেন। এছাড়াও স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে হাজং নেতা বিপিন হাজং, ললিত হাজং অবিশ্রান্ত চেষ্টা করেছেন। দুর্গাপুর থানার বগাউড়া গ্রামের প্রকাশ হাজং-এর যুবক ছেলে সুধীর হাজং পুটিমারীতে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হন। বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন যতীন্দ্র হাজং, যুধিষ্ঠীর হাজং, রবীন্দ্র হাজং, যাত্রামোহন হাজং, উকিল হাজং, নিখিল হাজং, বিপন্ন হাজং, ধীরেন্দ্র হাজং, সত্যেন্দ্র হাজংসহ আর অনেকে।[২৮] 'খাসিয়ারা সীমান্ত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ ও খবরাখবর আদান-প্রদানে সাহায্য সহযোগিতা করতো। ইয়নিস খাসির মতো অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধে সিলেটের দোয়ারাবাজারের কাঁকন নামে মহিলার অবদান স্থান পেয়েছে কিছু পুস্তকে।[২৯] কাঁকন বিবি মূলত মুক্তিবাহিনীর 'ইনফরমার' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ভিক্ষুক বেশে পাকিস্তানীদের ক্যাম্পে গমন করে মুক্তিবাহিনীর জন্য খবর বয়ে আনতেন। তিনবার সফল হওয়ার পর চতুর্থবারের মতো পাকিস্তানীদের টেংরা ক্যাম্পের

দিকে যাচ্ছিলেন ভিক্ষা করতে। শুক্রবার দিন, জুম্মার আজানের প্রাক্কালেই কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য কাঁকন বিবির পথ রোধ করে। বেশ কয়েকবার যাওয়া-আসাতে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগসূত্র রয়েছে এমন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু বরাবরের মতোই তিনি বলেছেন–'আমি আমার স্বামী আবদুল মজিদ খানের খোঁজে ক্যাম্পে যাই।' আবদুল মজিদ খান সীমান্তরক্ষী হিসেবে খাসিয়া অঞ্চলে কর্মরত অবস্থায় ১৯৫৮/৫৯ খ্রিষ্টাব্দে কাঁকনকে বিয়ে করেছিলেন। ভারতের মিজোরামে জন্ম হওয়া কাঁকন বিবি'র শুরু হয় নির্মম নির্যাতন। গাছের সাথে বেঁধে পেটানোর পর মোটা লোহার শিক গরম করে উরু দিয়ে ঢুকানো হয়। অজ্ঞান হয়ে যান, কিন্তু মুক্তিবাহিনীর বিপক্ষে কোনো কথা তার মুখ থেকে বের হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শহীদ মিয়াকে টেংরা ক্যাম্পে দেখা তথ্যাবলী সরবরাহ করলে তারা অপারেশন চালান এবং এতে সফলও হয়েছিলেন।[২০]

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে পাত্র আদিবাসীরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। পাত্র জনগোষ্ঠীর যে সকল বীর সন্তানেরা নিজের জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের অনেকের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া যায়, তারা হলেন– শ্রী যতিন্দ্র কুমার মহাপাত্র, শ্রী প্রফুল্ল পাত্র, অনিল পাত্র, উপেন্দ্র পাত্র, রাজিন্দ্র পাত্র।[২১] ২৫ মার্চের কালো রাতের পর মৌলভীবাজার মহকুমার কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, বড়লেখা, কুলাউড়া, সিলেট জেলার কোম্পানিগঞ্জ, বিশ্বম্ভপুর, হবিগঞ্জ মহকুমার চুনারুঘাট প্রভৃতি মণিপুরী অধ্যুষিত অঞ্চলের মণিপুরীরা স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বহিঃশত্রু প্রতিরোধ হিসেবে রাস্তায় ব্যারিকেড দানসহ শরণার্থীদের নিরাপদে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যেতে সহায়তা করে। মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন– কৃষ্ণকুমার সিংহ, সতীশচন্দ্র সিংহ, নীলকান্ত সিংহ, রবীন্দ্র কুমার সিংহ, নীলমনি চ্যাটার্জী। শহীদ হয়েছেন গিরীন্দ্র সিংহ। 'নীলমনি চ্যাটার্জী ...ত্রিপুরার কমলপুর হালাহালিতে আশ্রয় নিয়ে প্রায় বারো শত যুব-ছাত্রকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে কার্যকর ভূমিকা রাখেন।...অনেক মণিপুরী সশস্ত্র সৈনিকের মতো মুক্তিযুদ্ধের মহিমায় ভাস্কর হয়েছে কণ্ঠসৈনিক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাধন সিংহ, অনিতা সিনহা, বাণী সিনহা প্রমুখ। তিনজনই মণিপুরী গানের শিল্পী ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে মুক্তির গান গেয়ে উজ্জীবিত করেছেন মুক্তি পিয়াসী জনতাকে। ভারতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে উপার্জিত অর্থ বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে দান করেন।[২২] রাখাইন সম্প্রদায়ের বসবাস দক্ষিণের বরগুনা জেলা এবং কক্সবাজার এলাকায়। দেশের ক্রান্তিলগ্নে রাখাইনরা বরগুনার তালতলী এলাকায় অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছেন। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেশ স্বাধীনের অংশী হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধারা তালতলী থানার আগাঠাকুর পাড়াতে শ্রীমঙ্গল বৌদ্ধ বিহারকে স্থায়ী ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করে। এতদঞ্চলের উসিট মং, অংসিট ও অংথান যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। কক্সবাজার এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সিওয়ামোং, অনিও, আক্যমং নাম উল্লেখযোগ্য: '৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর মহেশখালির সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন মংছিয়েন। '১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হিন্দুদেরকে আশ্রয়দান ও সাহায্য-সহযোগিতা করার কারণে হানাদার পাক-সেনারা দক্ষিণ রাখাইনপাড়ার বৌদ্ধ মন্দিরটি পুড়িয়ে দেয় এবং ঠাকুরতলা বৌদ্ধ বিহারাধ্যক্ষ উ তেজেন্ত ভিক্ষুকে ৩জন শিষ্যসমেত গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে।[২৩]... রাখাইন মেয়ে প্রিনছা খেঁ।...সুরেন বাবুকে হত্যা করে প্রিনছোকে তুলে নিয়ে যায়। প্রিনছা দেখতে সুন্দরী ছিলেন। প্রিনছার ছিলো অসাধারণ রান্নার হাত। পাকিস্তানীদের দ্বারা অত্যাচারিত হতে হতেই ক্যাম্পের তৃতীয় বাবুর্চির কাজটা আদায় করে নেয়। তার অসাধারণ রান্না ও আচরণে সবাইকে ফাঁদে ফেলে দেয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রিনছার হাতেই রান্না খেতে চাইতো। অক্টোবর মাসে প্রিনছা পাকিস্তানী সৈন্যদের জানায় সে অসুস্থ, ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।...প্রিনছার প্রস্তাব শুনে ডাক্তার শুরুতে ভয় পেয়ে গেলেও প্রিনছার মনের জোর আর একাগ্রচিত্ত দেখে না বলার সাহস হলো না। বিষ হাতে পেয়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রিনছা পাকিস্তানী ক্যাম্পের সেনাদের জন্য রান্না করা খাবারের সাথে মিশিয়ে দিলো। ক্যাম্পে থাকা ৪২ জনকেই অনেক আদর যত্ন করে সেদিনের খাবার খাইয়ে সবাইকে অচেতন রেখে পায়ে হেঁটে চলে যায় বরিশাল। জানা যায়, ১৪ জন সে বিষে মারা গিয়েছিলো।[২৪]

উত্তরবঙ্গের অন্যতম আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী উরাঁও। মুক্তিযুদ্ধে বুদু উরাঁও-এর নাম প্রণিধানযোগ্য। 'এদের মধ্যে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর থানার টুকিয়াপাড়ার কাশিনাথ টিগ্গা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার মোকিম উরাঁও, গণেশ উরাঁও অন্যতম। ...শহীদ হন গোমস্তাপুর উপজেলার বেগপুর গ্রামের শ্রী চরণ উরাঁও।[২৫] রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিহীন অবস্থায় কন্দ জাতিগোষ্ঠীর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণকে অস্বীকার করা যায় না। '...বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রয়েছে– ভুবন কন্দ, ধনু কন্দ ১৯৭১-এর বীর মুক্তিযোদ্ধা।[২৬] '১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় বিহারীরা অনেক বাগদি পরিবারের লোকদের হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও ফুলচাঁদ বাগদি, বাগদি অনিল সরকার মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট পাননি। ... গেরিলাযোদ্ধা ছিলেন ভবানীপুরের বিশ্বম্ভ বাগদি।...হরিদাস বাগদিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। ...এছাড়া মঙ্গল পাণ্ডে (বাগদি), অরুণ সরকার (বর্তমানে পদবি হিসেবে কেউ কেউ সরকার ব্যবহার করে) মুক্তিযোদ্ধাদের খাবারের যোগান দিতেন।[২৭] আদিবাসী ভূমিজরা দেশমাতৃকার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। অসীম সাহসিকতার জন্য আজো স্মরণ করে শম্ভু সিং ভূমিজকে। রাজাকারদের প্ররোচনায় ধরা পড়েন এবং 'শরীরের এক একটা অংশ কেটে কেটে আলাদা করা হয়। এভাবে বীর মুক্তিযোদ্ধা শম্ভু সিং ভূমিজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।'[২৮] এছাড়াও বসুয়া ভূমিজ, বৃন্দা ভূমিজ, উমেশ ভূমিজ, রমেশ ভূমিজ, কালিকৃষ্ণ ভূমিজসহ অনেক ভূমিজ

মুক্তিযোদ্ধা আছেন। মাহাতোদের মধ্যে জয়পুরহাট পাঁচবিবির তেজেন্দ্রনাথ মাহাতো, গোপালচন্দ্র মাহাতোসহ অনেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছেন। তেরেসা মাহাতো, আদিবাসী মাহাতো জনগোষ্ঠীর নারী। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাটের রাজবাড়ির শীতল গ্রামে তার জন্ম। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুর থেকে এসএসসি পাশ করেন সেন্ট ফিলিপস্ স্কুল থেকে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ, এই সময়কালে তিনি দিনাজপুরে, নার্সিং প্রশিক্ষণের জন্য মিশন হাসপাতালে। '২৫ মার্চ কালো রাতে ঢাকাসহ দেশব্যাপী শহরগুলো বেশি আক্রান্ত হয়। তেরেসা মাহাতোদের হাসপাতালও আক্রান্ত হয় এবং তেরেসার হাত, পা, মাথায় গুলি লেগে বেশ আহত হন। নিবিড় পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি আর ফিরে যাননি গ্রামের বাড়ি, সেখানে থেকেই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। এভাবেই জড়িয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে।[৯] মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী মালোদের মধ্যে কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়– 'তারা হচ্ছেন ধীরেন মালো, শচীন্দ্র মালো, শকুর মালো, ভরত মালো ও জুয়েল মালো।...দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলনেও মালোরা ভূমিকা রেখেছেন।[১০] মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী জেলার চৈতন্যপুর ও আশপাশের গ্রামগুলোর রাজোয়াড়দের মধ্য থেকে কয়েকজন প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা হলেন– জয়চাঁদ রাজোয়াড়, অবতার রাজোয়াড়, ধীরেন্দ্রনাথ রাজোয়াড়, তেজলী রাজোয়াড় ও খগেন রাজোয়াড়।[১১] ছোট্ট জনগোষ্ঠী আদিবাসী কোল'রাও বসে থাকেনি। 'যোদ্ধাদের দু'একজন বেঁচে থাকলেও অনেকেই স্বর্গীয় হয়েছেন। অনেক খোঁজাখুজির পর পেয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী স্বর্গীয় সোখী চাঁদ-এর সন্তান মি. লক্ষণ কুমার মুরমুকে। লক্ষণ মুরমু'র সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলার পর তিনি অস্পষ্ট হলেও তার স্বর্গীয় মুক্তিযোদ্ধা বাবার অংশগ্রহণের গল্প বলেছিলেন।[১২]

মহান মুক্তিযুদ্ধে সাঁওতালদের অবদান অবিস্মরণীয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে পঞ্চগড় এবং সিলেট বিভাগের ৪টি জেলার সাঁওতালরা ওতপ্রোতোভাবে জড়িত ছিলেন। জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে মহান মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শহীদ ৪ মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভাস্কর্য উন্মোচন করা হয়। ভাস্কর্যটি নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলো রাজশাহী চারুকলা ইনষ্টিটিউট। বিগত ১৭ ডিসেম্বর, ২০১১ জয়পুরহাট জেলার জেলা প্রশাসক অশোক কুমার বিশ্বাস আদিবাসীর অস্ত্র হাতে নারী-পুরুষ ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করেন। এই চারজনই (শহীদ খোকা হেমরম, পিতা- লক্ষণ হেমরম; শহীদ মন্টু হেমরম, পিতা- লক্ষণ হেমরম; শহীদ মোহন সরেন, পিতা- কালু সরেন; শহীদ ফিলিপ সরেন, পিতা- লক্ষণ সরেন) ছিলেন আদিবাসী সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম নন্দইলের। আদিবাসীদের মধ্যে একমাত্র ইপিআর-এর রাইফেলম্যান উক্য চিং মারমা পাকিবাহিনীর বিরুদ্ধে অসম সাহসিকতার জন্য যুদ্ধের পরে তাঁকে বীরবিক্রম উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় আদিবাসীদের সম্পর্কে জয় বাংলা ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭১-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'আমরা বীরের জাতি। পৃথিবীর বীর জাতিগুলির তালিকায় সর্বাগ্রে বাঙালীদের নাম অবশ্যই থাকবে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে ট্যাঙ্ক, কামানের বিরুদ্ধে লাঠি, সাধারণ বন্দুক ইত্যাদি দ্বারা লড়াই করিয়া শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে তাহার তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। সাঁওতাল, গারো, হাজং, চাকমা, মগ ও অন্যান্য ভাইয়েরা আপনাদের বিষমাখা তীর-ধনুক লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ুন। সৈন্যদলে বিভিন্ন উপশাখা থাকে। আপনারা বাংলার ধনুক বাহিনী হইবেন'।[১৩] কবি আবদুস সালাম (আজাদ) লিখেছেন-

'...হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রিষ্টান আদিবাসী সবাই একাকার

দেশ গড়ার কাজে আছে সবার সম অধিকার।

তাজা বুকের রক্ত দিয়ে কিনেছি লাল সবুজের পতাকা

স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার– আছে কথা বলার অধিকার

বাংলা আমার বাংলা তোমার বাংলা সবার।'

❖ মিথুশিলাক মুরমু: আদিবাসী গবেষক ও কলামিষ্ট। দৈনিক সংবাদ-এ নিয়মিত কলাম লেখেন। বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে ১১টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

১. বাঙালি সংস্কৃতির ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবতার ঐতিহ্য, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, পৃষ্ঠা- ৪৮

২. বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয়া গবেষণা (দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পাদনা- মঙ্গল কুমার চাকমা, জেমস্ ওয়ার্ড খকশী, পল্লব চাকমা, মংশিংঞো মারমা, হেলেনা বাবলি তালাং: উৎস প্রকাশন, পৃষ্ঠা-৪১৫।

৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র নবম খণ্ড: পৃষ্ঠা- ৫৮২

৪. শহীদ ফাদার উইলিয়াম ইভান্স, হারুন-অর-রশিদ, পৃষ্ঠা-৬৬

৫. বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয়া গবেষণা (প্রথম খণ্ড), সম্পাদনা- মঙ্গল কুমার চাকমা, জেমস্ ওয়ার্ড খকশী, পল্লব চাকমা, মংশিংঞো মারমা, হেলেনা বাবলি তালাং: উৎস প্রকাশন, পৃষ্ঠা-৮৭।

৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৯৮।

৭. ঐ, পৃষ্ঠা-১৪৮।

৮. ঐ, পৃষ্ঠা-১৭০।

৯. ঐ, পৃষ্ঠা- ২১১-২১২।

১০. ঐ, পৃষ্ঠা- ৩১৪-৩১৫।

১১. ঐ, পৃষ্ঠা-৪২৩।

১২. প্রথম আলো ১৯.১১.২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

১৩. বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয়া গবেষণা (দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পাদনা– মঙ্গল কুমার চাকমা, জেমস্ ওয়ার্ড খকশী,

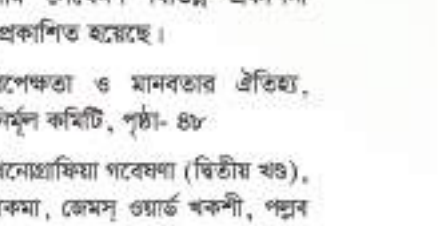

পল্লব চাকমা, মংসিংগ্রো মারমা, হেলেনা বাবলি তালাং; উৎস প্রকাশন, পৃষ্ঠা-৬৪।

১৪. কন্যাশিশু-১৬, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম, সম্পাদনায়- ড. বদিউল আলম মজুমদার, পৃষ্ঠা- ৫৮-৫৯

১৫. বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয়া গবেষণা (দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পাদনা– মঙ্গল কুমার চাকমা, জেমস্ ওয়ার্ড খকশী, পল্লব চাকমা, মংসিংগ্রো মারমা, হেলেনা বাবলি তালাং; উৎস প্রকাশন, পৃষ্ঠা-১২৯।

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা-১৭২।

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা-২১৫।

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা-২৪৯।

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা-২৯৩।

২০. দৈনিক সংবাদ, ০৯.০৫.২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

২১. বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয়া গবেষণা (দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পাদনা– মঙ্গল কুমার চাকমা, জেমস্ ওয়ার্ড খকশী, পল্লব চাকমা, মংসিংগ্রো মারমা, হেলেনা বাবলি তালাং; উৎস প্রকাশন, পৃষ্ঠা- ৩২০।

২২. ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৬৪।

২৩. ঐ, পৃষ্ঠা- ৪১৫।

২৪. কন্যাশিশু-১৬, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম, সম্পাদনায়- ড. বদিউল আলম মজুমদার, পৃষ্ঠা- ৬০-৬১।

২৫. বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয়া গবেষণা (তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদক– মেসবাহ কামাল; উৎস প্রকাশন, পৃষ্ঠা-৫৬।

২৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৯৭।

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা-২৪৮।

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা- ২৮৪।

২৯. কন্যাশিশু-১৬, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম, সম্পাদনায়- ড. বদিউল আলম মজুমদার, পৃষ্ঠা- ৫৯।

৩০. বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয়া গবেষণা (তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদক– মেসবাহ কামাল; উৎস প্রকাশন, পৃষ্ঠা-৩৪৯।

৩১. ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৯৫।

৩২. বিপন্ন আদিবাসী কোল জনগোষ্ঠী, স্টেফান সরেন, নওরোজ প্রকাশনি, পৃষ্ঠা- ৫১

৩৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ; দলিলপত্র ষষ্ঠ খণ্ড; পৃষ্ঠা- ৮

আকর গ্রন্থসমূহ:

১. মিথুশিলাক মুরমু, বীরগাঁথা মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ঢাকা।

২. আইয়ুব হোসেন ও চক্রু হক, মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী, ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলা বাজার ঢাকা।

মান্দি অঞ্চলের না বলা কিছু কথা

সঞ্জীব দ্রং

১. একাত্তরের মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আমরা 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার' অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলাম (দেখুন বাংলাদেশের সংবিধান)। মুক্তিযুদ্ধে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য এ দেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, আদিবাসী সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে আমাদের প্রিয় স্বদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে চলেছে, খাদ্য উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য, পোশাক শিল্পে ঈর্ষণীয় অগ্রগতি, নারী শিক্ষায় সাফল্য, মাতৃমৃত্যুহার ও শিশুমৃত্যুহার হ্রাস তথা এমডিজি অর্জন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, ডিজিটালাইজেশন ইত্যাদিতে সাফল্য অর্জিত হলেও দেশের জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের জীবনে মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আশানুরূপ অগ্রগতি স্বাধিত হয়নি। একটি কল্যাণকামী মানবিক রাষ্ট্রের দিকে পথচলার গতি খুব একটা গতিশীল হয়নি। বরং সমাজে ও রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকার বার বার আমাদের পেছনে ঠেলে দিয়েছে। এখনো কিভাবে ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব রটিয়ে নিমিষেই সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর, সম্পদ ও উপাসনাগৃহ ছারখার করে দেয়া যায় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসে। তাই সকলের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার সংগ্রাম এখনো চলমান আছে।

আমরা জানি, বিশ্বের সকল দেশেই ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষ আছেন। আজ এখানে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিশ্বের অনেক দেশেই তারা সংখ্যালঘু নাগরিক। এই সংখ্যালঘু জনগণকে দেশে দেশে জাতীয় রাজনীতির নানা হিসাব-নিকাশের কারণে কঠিন সংকট মোকাবেলা করে বেঁচে থাকতে হয়। অনেকে সংখ্যালঘু হওয়ার দুঃখকে নিয়তি ভেবে জীবন পার করে দেন। এই কারণেই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯২ সালে একটি মাইনোরিটি ডিক্লারেশন গ্রহণ করে। এই ঘোষণাপত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু জনগণের আত্মপরিচয় ও অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের। সংখ্যালঘু মানুষের এই পরিচয় ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সকল আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে। অর্থাৎ দেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, নাগরিক অধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে রাষ্ট্রকে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে।

মহাত্মা গান্ধীসহ বিশ্বের অনেক মণিষী বলে গেছেন, একটি দেশ ও একটি সমাজ কত বেশি গণতান্ত্রিক, কত বেশি সভ্য ও উন্নত, তার বিচার্য বিষয় হলো সেই দেশে ও সেই সমাজে সংখ্যালঘু জনগণ কেমন আছেন। একটি জাতির মহত্ত্ব বা বিশালত্ব তখনি প্রকাশ পায়, যখন সেই জাতি অন্য সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জাতি মানুষের সঙ্গে মানবিক আচরণ করে।

সংখ্যালঘু জনজীবনে বিরাজিত বহুমুখী সংকট থেকে উত্তরণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বেশ কয়েকটি অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছিল। যেমন:

- অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।
- জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হবে।
- সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা এবং সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে।
- সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থার অবসান করা হবে।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

জাতিসংঘ এসডিজির মূলসুর নির্ধারণ করেছে, কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না বা লীভ নো ওয়ান বিহাইন্ড। অর্থাৎ সকলকে সাথে নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসে একটি মানবিক রাষ্ট্র ও একটি ইনক্লুসিভ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকল নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে।

২. আমাকে যখন বলা হলো পচাত্তর পরবর্তী সময়ে গারো অঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং তার ফলে সেখানে মানুষের জীবন সংগ্রাম, মান্দিদের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ, নানামুখী অনিশ্চয়তা, সরকারের ইতিবাচক কিছু পদক্ষেপ, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের গোড়াপত্তন ইত্যাদি নিয়ে লিখতে হবে, তখন খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যার পর বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সূচনা করেছিলেন, সেটি সংঘটিত হয়েছিল মেঘালয় সীমানা বরাবর গারো পাহাড় অঞ্চলে। আমি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পঁচাত্তর পরবর্তী এই সংগ্রামের বিবরণ বা এই সব নিয়ে বড় কোনো লেখা বা কোনো বই খুঁজে পাইনি। এই